SKS

শুভ নববর্ষ ১৪২৯

“এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক।।”

এসকেএস ফাউণ্ডেশন

বিশেষ ক্রোড়পত্র

১লা বৈশাখ ১৪২৯

নববর্ষের শুভেচ্ছা

বছর ঘুরে আমরা পেলাম বাংলা নতুন বছর ১৪২৯। নববর্ষকে বরণ করে নিতে আমাদের মন প্রস্তুত, আয়োজনের যেন কমতি নেই। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলেই পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে প্রাণের উৎসবে মেতে ওঠেন। নতুন বছরের উৎসবের সঙ্গে বাঙালির গ্রামীণ জীবনের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে জড়িত। আমরা যে বাঙালি জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিত সেই বাঙালির কৃষ্টি ও ঐতিহ্য আমরা কেউ ভুলতে পারি না। প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলে গিয়ে আমাদের সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত যা কিছু নতুন তার সবই আমরা বরণ করে নেই। এটিই প্রমাণ করে বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ সর্বজনীন। মহামারীর মধ্যে তাই আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বলতে হয়: 'মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।' আমরা অতীতের সমস্ত গ্লানি ভুলে গিয়ে নতুনের পথ চলা, নতুন করে শুরু করা, হতাশাকে ভুলে গিয়ে এক সুন্দর ভ্রাতৃত্বময় সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখি। নববর্ষে বাঙালী নারী-পুরুষ একসাথে নানা রঙের শাড়ি, পাঞ্জাবি পরে মেতে উঠবে বাঙালী সংস্কৃতির নিরাপদ নানা আয়োজনে। সবার অংশগ্রহণে বৈশাখী মেলা হয়ে উঠবে এক অসাম্প্রদায়িক মিলন মেলা। এসকেএস ফাউন্ডেশন বাঙালির এই প্রাণের উৎসবকে উদযাপন করে নানা অনুষ্ঠান-আয়োজনের মাধ্যমে। নতুন বছরের আগমনে বিগত বছরের সকল গ্লানি, সকল জীর্ণতা দূর হোক, সুন্দর হোক আগামীর দিনগুলো। সুন্দর হোক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।

এসকেএস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা- শুভ নববর্ষ।

রাসেল আহমেদ লিটন
নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

পহেলা বৈশাখ

ড. দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস*

এসো তবে রোশেনারা অগ্নি নর-নারী যত
রক্ত সখ্য এই চৈত্রময়
দীপকে ঝংকার তুলি বাঙালীর শব্দের মালায়
কপোতাক্ষী নদীকূলে নববর্ষ নতুন আশায়
মুজিবের জয় বাংলা জয়।
- রামেন্দ্র দেশমুখ্য

পহেলা বৈশাখ বাঙালি জীবনে একটি আলাদা স্বত্তায় দিন। একটি দিন- একটি পুনর্জাগরণ। বাংলা পঞ্জিকার বসন্তের শেষ রাত্রির নক্ষত্রগুলো ডুবে যায়। আর লাল সূর্যের আলোয় চড়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে বাংলা বছরের প্রথম দিন। মানুষ জাগে। শহর জাগে, গঞ্জে ও গ্রামে জাগে। এদিন মানুষের ভেতরে প্রভাত সূর্যের মতো আরো একটি মানুষ জাগে- আবহমান বাঙালি মানুষ। গেঁয়ো বা লোকায়ত বলে আধুনিক নয় মনে করে আমরা নিজেদের অনেক কিছু হারাতে বসেছি। বৈশাখের প্রথম দিন প্রোটো-বাঙালির শাশ্বত বাঙালির জীবনের এক অনুষঙ্গ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। বাঙালির মাঙ্গলিক চিন্তা, বস্তুগত প্রয়োজন মেটানোর কারু-দক্ষতা, জীবন উদ্‌যাপনের নান্দনিকতা সবকিছুই এদিনে চোখে পড়ে। আমরা বুঝতে পারি বাঙালি তার জৈব স্বত্তার হদিস হারায়নি। তার প্রাণশক্তি ফুরায়নি। তার জাগরণের অভ্যাস, তার স্মৃতি-স্বপ্নকে পাহারা দিচ্ছে।

বাংলার নববর্ষের প্রবর্তন কে করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ বলেন রাজা শশাঙ্ক, কেউ বলেন সম্রাট আকবর। যেই করুক না কেন, সেটি ছিল উপনিবেশিক আরোপণ। কর বা খাজনা আদায় করার উদ্দেশ্যে বাঙালির ওপর চাপিয়ে দেওয়া পঞ্জিকার প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ। তখন সম্রাজ্যের সাথে প্রজাদের মন আনুষ্ঠানিকভাবে বেঁধে রাখার উপায় হিসেবে নববর্ষ পালনের প্রথা চালু করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়। এর আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল। শাসকদের আধিপত্যকে দৃশ্যমান করে তোলা। কিন্তু আমাদের বহিরাগত বর্ষ কিংবা সংস্কৃতি আত্মীকরণ করার সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। পহেলা বৈশাখের বর্ষ শুরুর দিন হিসেবে বাঙালি আত্মীকরণ করেছে। পহেলা বৈশাখের গায়ে নিজস্ব সংস্কৃতির রং লাগিয়েছে। তাই চারশো বছর পরে পহেলা বৈশাখের সাথে উপনিবেশের যা কিছু লেগে ছিলো তা মুছে গেছে। পহেলা বৈশাখের সকল স্বত্ত্বের মালিকানা এখন জাত বাঙালির।

বাংলার বৈশাখ কেবল পঞ্জিকা থেকে বেরিয়ে আসে না। এজন্য একটি আয়োজন চলে। প্রকৃতি তাপদগ্ধ হয় নিদাঘ দিনে। চৈত্রের শুরু থেকেই সমুদ্র হাওয়ায় মেঘ আসে। প্রায় প্রতিদিন চলতে থাকে মেঘাচ্ছন্ন বিকেলের গল্প। মাঝে মাঝে দিগন্তের ওপার থেকে বৃষ্টির সুঘ্রাণ আসে। কৃষি যখন আসন্ন ছিল তখন ফসল বোনার জন্য কৃষকদের বৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হতো। গ্রীষ্মের দাবদাহে মাটিতে মাটিতে জাগাত পিপাসা। মুকুল ঝরে যাওয়া আম গাছে, জাম গাছে, বট কিংবা বট-ডুমুরের নতুন পল্লবের আড়ালে চাতক ডাকতো 'ফটিক জল' বলে। গ্রামীণ বাঙালির কাছে তখন বৈশাখ ছিল আবাদের আয়োজন করার মাস। মাঠে ফসল বোনার সময়। আবাদের আয়োজন শুরু হতো পহেলা বৈশাখ থেকে। চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা হতো। পহেলা বৈশাখেও হতো। মাঠের গগণে রোদ আর নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে ঢাকের শব্দ শোনা যেতো। ব্যবসায়ীরা দেনা-পাওনার হিসাব সেরে নতুন বছরে নতুন খাতা খুলতেন। এইসব উৎসব আর মুখরতার ভেতরে মেলায় থাকতো কাজের সহায়ক সরঞ্জাম, তৈজসপত্র, মাটির হাড়ি, সরা, মসলা, থামা, কাঠা, ঝুড়ি, খুন্তি, দা, কুড়াল, ছুরি, কাঁচি, বাঁশি, পুতুল, খেলনা, চুড়ি, কাজল লতা এবং টিপতো বটেই।

পহেলা বৈশাখের বর্তমান ভাব ও রূপের গঠন অনেকটা রবীন্দ্রনাথের হাতে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রতিটি ঋতু সম্পর্কে আলাদা করে লিখেছেন। বৈশাখের যে দুঃসহতা অন্তরালে তিনি পুনর্গঠন করেছেন তার সাথে বাঙালি চিত্তের একটি সত্যের মিল আছে। নিরীহ বলে আর মুখবতার বৈশাখের বাংলার কাছে এক বিদ্রোহের দেশ। বৈশাখ বাঙালির অগ্নিময় বিদ্রোহী সত্তার নিসর্গ-রূপ। রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে উপাসনা ও উৎসবের মাধ্যমে নববর্ষ পালনের রেওয়াজ চালু করেন। ১৯৬০ দশকে পহেলা বৈশাখের উৎসব হয়ে উঠে পাকিস্তানি উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বাঙালির আত্মজাগরণে, জাতীয় চেতনার নির্মাণে এবং স্বাধিকারের সংগ্রামে এই উৎসব মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর কারাগারের রোজনামচায় উল্লেখ করেছেন, ১৯৬৭ সালে জেলে বসে তিনি পহেলা বৈশাখ পালন করেছিলেন। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু পহেলা বৈশাখকে জাতীয় উৎসব হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন।

ষাটের দশক থেকেই ঢাকার রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নববর্ষ উদযাপন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। ১৯৮৯ সাল থেকে বর্ষবরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ। বৈশাখের প্রথম সকালে তাদের মঙ্গল শোভাযাত্রায় বাঙালির আবহমান ঐতিহ্যের সকল আইকনিক প্রতীক, হাতি, ঘোড়া, নানা অভিব্যক্তির মুখোশ, শোলার পাখি, টেপা পুতুল, ঢাক-ঢোল ইত্যাদির সমাবেশ ঘটে। ২০১৬ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এই শোভাযাত্রা। দেশের তরুণ প্রজন্ম আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যুক্ত করেছেন। বাংলা নববর্ষ উদযাপনে আলপনা আঁকা তো ছিলই। এক সময় আলপনা আঁকা হতো বাড়ির উঠানে কিংবা ঘরের দেয়ালে। রাজপথে আলপনা আঁকা হতো শহরে। এখন পহেলা বৈশাখে আমাদের সংস্কৃতির নানা প্রতীক আঁকা হয় শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের মুখের ক্যানভাসে। গ্রামে, শহরে ও নগরে প্রধানত তরুণদের উদ্যোগেই পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে লোক-বাংলার সঙ্গীত আয়োজন করা হয়। একসময় আয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক থেকেই ছিল। পহেলা বৈশাখ আর হালখাতা উপলক্ষ্যে গ্রাম বাংলায় কবিগান, তর্জা, পালাগান কিংবা পুতুল নাচের আসর বসতো। ব্যবসার ব্যাপারি নববর্ষ উদযাপনের সাথে কমবেশি আগেও ছিল। এখন এর ব্যাপ্তি বেড়েছে। দেশের ফ্যাশনবেত্তারা নববর্ষের পোশাকে অভিনব সব সংযোজন ঘটিয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বাংলা নববর্ষের উৎসব বাঙালির শক্তি, ঐশ্বর্য, ধ্যান ও ভাব এবং মানবিকতা সম্পর্কে বলার মতো নিজস্ব একটি ভাষা অর্জন করেছে।

পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষের নিজস্ব একটি স্বর রয়েছে। হয়তো পৃথিবীর সব জাতির নববর্ষেরই থাকে। বাংলা নববর্ষ বাঙালির সহজ ভাবের কথা বলে। চর্যাপদ থেকে আমরা সহজ পাদের নাম জানি। তার রচিত দোহাকোষের টীকাকার বলেছেন, 'সকল লোক এই জাতীয় নিবন্ধ-ইহাই সহজভাব'। পহেলা বৈশাখের উৎসব এই সহজভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের বাইরে এসে মানবিক সত্তায় মিলিত হয় বাঙালি। বিশ্বাস, আচারে, ভুবনদৃষ্টির বহিরাঙ্গে বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু আমরা শেকড়ে এক। পহেলা বৈশাখের উদযাপন সর্বতোভাবে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের কথা বলে।

পঞ্চাশ বছর হলো বাংলাদেশ রাষ্ট্র উপনিবেশমুক্ত হয়েছে। কিন্তু এদেশের বহু মানুষের মনে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা স্তরে উপনিবেশের অবশেষ রয়ে গেছে। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের উপর ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক এবং নয়া-উপনিবেশের থাবা চেপে বসতে চাচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে। পহেলা বৈশাখ এই লড়াইয়ে বেগবান করার শক্তি জোগায়। নববর্ষ রূপকথার মতো আসে। আবার স্বপ্নের মতো হারিয়েও যায়। জাগরণটুকু মিহিয়ে আসা বৃষ্টির মতো চোরা-জানা প্রাত্যহিকতায় দূরে সরে যায়। কিন্তু বছরান্তে বৈশাখের এই একবার আসার ভেতরের বড় একটা জানান আছে। সামনের ইতিহাসে ভেতরে বাঙালি হেঁটে যাবে মানবিক চেতনা আর যুদ্ধ জয়ের গৌরব নিয়ে। অশুভ শক্তির ধ্বংস থেকে পাবার আওয়াজ চারিদিক-সরব সকল অপশক্তি পরাজিত হবে। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখ আমাদের সেই কথাই বলে যায়।

*প্রফেসর, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।

পয়লা বৈশাখ ও রমনা বটমূল

ড. আতিউর রহমান*

করোনার কারণে দুবছর রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ আয়োজন হতে পারেনি। এ বছর আবার বর্ষবরণ হবে রমনা বটমূলে। ২০১৭ সালে রমনা বটমূলে বাঙালির নববর্ষ আয়োজনের পঞ্চাশ বছর উদযাপিত হয়েছিল। সেবার ছিল নানা আয়োজন। সেই আয়োজনে ছিল আনন্দ, বাঙালির আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান এবং অসাম্প্রদায়িকতার বাণী তুলে ধরা। এ বছর এই আয়োজন হবে আরও অর্থবহ। করোনাকালে বিশ্ব জুড়ে নেমে আসে গভীর হতাশা। মানুষের জীবন ও জীবিকা-দুইই পৌঁছে যায় অনিশ্চয়তার খাদের কিনারায়। গত দু'বছর ধরেই আমরা ঘরবন্দী ছিলাম। সেসময়টায় নেমে এসেছিল ‘মানবিক-সামাজকি-মানসিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়।’ সেই ধ্বংসস্তুপ থেকে আলোর পথে হাঁটতে এবারে সমবেত হতে চাইছে নববর্ষে রমনার বটমূলে। নিশ্চয় নব আনন্দে জাগবে মানুষ। বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার বোধ সৃষ্টির এই স্থায়ী ঠিকানায় আমরা সমবেত হবো নব প্রত্যাশায়। নিঃসন্দেহে আমাদের সাংস্কৃতিক লড়াই-এ পয়লা বৈশাখ বরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সেই ইতিহাস আমাদের অনেকের কাছেই অজানা। এর শুরুটা এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন নিজেদের বাঙালি হিসেবে দাবি করাটাই সাহসের কাজ ছিল। আমাদের সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব সেই সাহস দেখাতে পেরেছিল বলেই বাঙালির আত্মপরিচয়ের এই সংগ্রাম শেষ অব্দি রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে মিশে গিয়ে এক অভাবনীয় মুক্তিসংগ্রামে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

গত পঞ্চান্ন বছরে আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে বিস্ময়কর সব পরিবর্তন ঘটে গেছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক এই অভিযাত্রার পেছনের সংগ্রাম ও সহমর্মিতার কথা আজকের প্রজন্ম খুব সামান্যই জানে। সাম্প্রদায়িকতার আবরণে পূর্ব-বাঙলার বঞ্চিত অবহেলিত কৃষক, শ্রমিক, নিম্ন ও মধ্যবিত্তের বিপুল সংখ্যক মানুষকে মূলত: অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে পাকিস্তান নামের নষ্ট ভ্রষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে গণভোট দিতে উৎসাহিত করা হয়। উপমহাদেশ বিভক্তির ফসল পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্মের পরপরই পূর্ব-বাংলার ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বড়ো অংশ পাকিস্তানী এলিটদের এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেন। বিশেষ করে, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ শুরু হয় একেবারে দেশ-বিভাগের পরপরই। এই আক্রমণ, অবশ্যি, বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেননি সেদিনের ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার অজুহাতে সেদিনের সক্রিয় ছাত্রনেতা শেখ মুজিবসহ অনেকেই গ্রেফতার হন। এই আন্দোলনের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে। বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির মান-মর্যাদা বজায় রাখতে শাহাদাৎ বরণ করেন একদল তরুণ। আর এভাবেই বাঙালি জাতিসত্তার বীজ বপন করেন এদেশের তরুণ সম্প্রদায়। এরপর বাঙালির প্রাণের দাবি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় মর্যদা দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র। কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল এবং মিলিটারি-সিভিল আমলাদের সাথে নিয়ে পূর্ব-বাংলাকে তার ন্যায্য রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে। এর বিপরীতে বাঙালির প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক প্রধান নেতা হিসেবে জেল জুলুম সহ্য করে আবির্ভূত হতে থাকেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছ-দফা পেশ করার আগে ব্যাপকভাবে বাঙালির দুঃখের কথা বলতে গিয়ে জেল জুলুম সহ্য করেন। বাঙালি সংস্কৃতির মূল পাটাতন তৈরি করেছেন যেসব কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী তিনি তাঁদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের ভাবাদর্শ ধারণ করতেন। এভাবেই বাঙালির জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও সংস্কৃতি হাতে হাত ধরে বিকশিত হতে থাকে।

এমনি এক পর্যায়ে এলো কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী পালনের বছর ১৯৬১ সাল। যথারীতি রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালনে পাকিস্তান সরকার অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর প্রতিবাদে গণমুখী আঙ্গিকে সুর ও সংগীতকে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে সন্‌জীদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, মোখলেসুর রহমান (সিধু ভাই), আহমেদুর রহমান (‘ভিমরুল’) সহ আরো অনেকেই সাম্মিলিত উদ্যোগ নেন এবং বাঙালির ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ছায়ানট প্রতিষ্ঠা করণে। মূলত: ছায়ানট সংগঠকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক, হাইকোর্টের বিচারপতি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুণীজনেরা ঐক্যবদ্ধভাবে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন করতে এগিয়ে আসেন। আমরা ‘রবীন্দ্রসংগীত’ গাইবই বলে সেদিন জোর সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। একই সঙ্গে তিনি নজরুলকে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপনেরও বিরুদ্ধে ছিলেন। আর সেকারণেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রবোধ মিলে মিশে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পোক্ত করা সম্ভব হয়েছিল পাকিস্তানী সেই আঁধার যুগে। তবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার ধারা বিবরণীটি ঠিক সেভাবে বলে উঠতে পারিনি আমরা। তাই বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন নির্মাণের রাজনৈতিক যুদ্ধের ভিত গড়তে, সংস্কৃতি কর্মীরা, বিশেষ করে ‘ছায়ানট’ সংগঠক ও কর্মীদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা আজকের তরুণ প্রজন্মকে জানানোর প্রয়োজন রয়েছে। সুর দিয়ে মানুষের মনের গভীরতর স্বপ্নকে প্রভাবিত করার এই প্রচেষ্টাকে আরো সক্রিয় করার অভিপ্রায়েই ১৯৬৭ সালে রমনা বটমূলে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেন ছায়ানট সংগঠকগণ। প্রয়াত ড. নওয়াজেশ আহমদ ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক একজন বিজ্ঞানী। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এক স্মারক বক্তৃতায় (২০০৭) তিনি বলেছিলেন কিভাবে রমনা বটমূলের পয়লা বৈশাখের সূত্রপাত হয়। তিনি বলেছেন, “১৯৬৭ সনে ওয়াহিদুল এবং সন্‌জীদা আমাকে বলল, “এবার আমরা বাংলা নববর্ষ বাইরে করব। তুমি একটা গাছ দ্যাখো”। আমার উপর ভার দিল ওয়াহিদুল। আমি ওয়াহিদুলকে রমনা বটমূলের কথা বললাম।

রমনা বটমূলে আজ যেখানে অনুষ্ঠান হয় সেটা আসলে বট নয়। অশ্বত্থ। আমরা বট বলেই চালিযে দিয়েছিলাম। জায়গাটা এখন যেমন তখন তেমনটা ছিলনা। চারদিকে শুধু জঙ্গল আর ঘাসে ভর্তি। তবু আমি ওয়াহিদুলকে বললাম জায়গটা কিন্তু খুব শান্ত। কোলাহল মুক্ত। ছায়ানটের ছেলে-মেয়েদের ভালোই লাগবে। ও রাজি হয়ে গেল। সারারাত আলো জ্বেলে ছায়ানটের কর্মীরা সেই ঘাস কাটল, জঙ্গল পরিস্কার করল। এভাবেই ছায়ানটের বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হল। আজ এই অনুষ্ঠান যে জাতীয় পর্যায়ে চলে গেছে তাতে আমার খুব ভালো লাগে।” (দেখুন, আতিউর রহমান, রবীন্দ্রসাধক ওয়াহিদুল হক, দিপ্তী প্রকাশনী ২০১১, পৃ. ৩১১)।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে স্বরূপ চেতনার যে সংকট চলছিল, মুসলমান না বাঙালি এই দ্বিধা ঘুচাবার ব্রত নিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির মূল ধারার সন্ধান দিয়েছে ছায়ানট। একই সঙ্গে প্রবাহমান বাঙালি ঐতিহ্যের চর্চা করে চলেছে ছায়ানট। সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে জাগ্রত করে যাচ্ছে বাঙালির হৃদয়। আজো পুরোপুরি সক্রিয় ছায়ানট। ছায়ানটের সাংস্কৃতিক স্বাধীকারের মৌল নীতি তথা বাঙালি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ক্রমেই মানুষকে টানছে এবং রাজনীতিতে ফেলছে বড় মাপের প্রভাব। তা সত্ত্বেও, চ্যালেঞ্জও বাড়ছে। শিক্ষার গুণমানের অবনতি এবং তাতে পশ্চাৎচিন্তা আমাদের সাফল্যকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

১৯৬৭ সনে রমনার বটমূলে এই অনুষ্ঠানের সূচনা ছায়ানটকে বৃহত্তর জনসম্মুখে আনতে সাহায্য করেছে। এ কথা তো সত্যি রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সংস্কৃতিকে হিমালয়ের মতো রক্ষা করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বলে এসেছেন যে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে হলে এর ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে সমাজে, সংস্কৃতিতে। তাই বাঙালির উৎসবগুলোর পুনরুজ্জীবনের পক্ষে ছিলেন তিনি। গ্রামীণ মেলাগুলো পরিচালনা করতে তিনিই বলেছেন। এরফলে বাঙালির সামাজিক বন্ধন পোক্ত হবে বলে তিনি মনে করতেন। সেই অভিপ্রায়েই ছায়ানট বাঙালির নিজস্ব ‘শুভ নববর্ষ’ উদ্‌যাপনের এই আয়োজনের সূত্রপাত করে। বলা যায় ছায়ানট রবীন্দ্রনাথের সেই জাগরণের অগ্রগামী এক প্রতিষ্ঠানের নাম। এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনের ভাবনটির কথা সন্‌জীদা খাতুন এভাবে জানিয়েছেন, “আমরা এক সময় ‘শ্রোতার আসর’ নামে একটা অনুষ্ঠান করতাম। গান শুনিয়ে আমরা ‘অতীতচারী’ করতে চাইতাম। সেইসব গান বাঙালির বলে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দেখা গেল, আমাদের দেশে শিক্ষার সংখ্যা খুবই কম। কারণ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। তখন শুধুমাত্র ঐ বুলবুল একাডেমী ছিল। সেইজন্য আমরা একটা স্কুল করা দরকার বলে মনে করতাম।... গান মানুষের জীবনে সংস্কৃতির বড় একটা ছাপ ফেলে।” (দেখুন, আতিউর রহমান, ঐ, পৃ. ৫৪)।

সেই ছায়ানট এখন এক মহিরুহে পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া জমিতে সকলের প্রচেষ্টায় এক কর্মচঞ্চল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নাম ছায়ানট। এর সঙ্গে সম্পূরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাঙালির মননকে সিক্ত করে চলেছে রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ।

এই সংস্কৃতিভবন উদ্বোধনের দিন প্রয়াত ওয়াহিদুল হক বলেছিলেন, “নগরের মানুষদের অসাম্প্রদায়িক করার আন্দোলনে ছায়ানট খানিকটা সফল হয়েছে। এবারে গ্রামের সাধারণ মানুষকেও শুদ্ধ সংস্কৃতির পরশ দিতে হবে। সকলকে সঙ্গে নিতে পারলে সম্পূর্ণ বাঙালি হওয়া যাবে।”

স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রমনা বটমূলের এই নববর্ষ উদ্‌যাপন এখন সারা দেশ এবং বাঙালি অধ্যুসিত বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। লক্ষ লক্ষ বাঙালি বাংলা নববর্ষে পথে নেমে পড়ে। নুতন জামা কাপড় পড়ে এক উজ্জ্বল সকালে তাদের আনন্দঘন উপস্থিতি বাঙালির অস্তিত্বের জানান দেয়। পাশাপাশি চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে বের হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের এক অসাধরণ অগ্রযাত্রার প্রতীক বাঙালির এসব আয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্প্রতি ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের আলোর পথযাত্রাকে পুরোনো সেই সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে চাইছে। গেল বছর দুর্গাপূজা উদযাপনের সময় আমরা কিছু কিছু জায়গায় ধর্মান্ধগোষ্ঠীর অপতৎপরতা দেখেছি। তখন কিন্তু ছায়ানটসহ সকল সাংস্কৃতিক সংগঠনই এই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। কোমলমতি তরুণদের বিভ্রান্ত করার বিরুদ্ধে সেই প্রতিবাদ আরও জোরদার করার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। অথচ সেই কতো আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোন বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মুল্য সেইটেকেই সহজপ্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি।” (রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৬৬৬)।

এমন বিভেদকে ঠেকানোর একটা বড়ো উপায় হতে পারে সংগীত চর্চা। কেননা, সংগীতই পারে জীবনের অসামঞ্জস্যগুলোর অবসান ঘটিয়ে এক নয়া পারসপেকটিভ দিতে। সংগীত শিল্পের এই অসাধারণ ক্ষমতার কথা রবীন্দ্রনাথই তার ছিন্নপত্রে বলে গেছেন ।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে মনে রেখেই আমরা স্মরণ করবো বাঙালির পঞ্চাশ বছর ধরে সাহসের সঙ্গে স্বকীয় সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার পক্ষে এগিয়ে যাবার এই অবিস্মরণীয় কাহিনী। এই বটমূলেই নিক্ষিপ্ত হয় বিধ্বংসী বোমা। সেদিন মাত্র কয়েক মিনিট আগে ঠিক ঐ জায়গাতেই আমি সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাড়া ছিল বলে বের হয়ে এসেছিলাম সেখান থেকে। কিন্তু সেদিন ঐ আক্রমণে হারিয়েছি আমরা বেশ কিছু তাজা প্রাণ। শুধু কি তাই? আমাদের মুক্ত সংস্কৃতি চর্চাকে করেছে নানা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত। কিন্তু তাই বলে সংস্কৃতি কর্মীরা বসে নেই। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে তারা সম্মুখ পানে। রাষ্ট্র যদি সুবিধাবাদী আচরণ না করে, শিক্ষায় যদি অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিরোধী হস্তক্ষেপ না করে, সমাজ যদি সর্বদাই সচেষ্ট থাকে মুক্তিযুদ্ধের মৌল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি দায়বদ্ধ তাহলে নিশ্চয় বাংলাদেশ ও বাঙালি সংস্কৃতির এগিয়ে যাওয়াকে কেউ রুখতে পারবে না। ‘অন্ধকার থেকে আলোর’ পথে আমাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক–সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। বিশেষ করে কভিড-উত্তর এই পুনরুদ্ধারের সময় এই উদ্যমের কোনো বিকল্প নেই।

*ড. আতিউর রহমান
সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ

বৈশাখে অন্য মানুষ

বাপ্পি খান

হৃদয়ের অন্তরালে ডুবে যায় ছাঁয়া
কিছু মায়া ডেকে আনে বৈশাখী ঝড়,
উড়ে উড়ে সুরে সুরে কাঁদে আবেগ,
বৈশাখের তপ্তরোদের আসে যেমন হঠাৎ ঝড়,
কবিতার শব্দে জানি আমিও
সাইক্লোনে উড়িয়ে দিতে কারও হতচ্ছাড়া আস্ফালন।

একদিন এক বৈশাখী মেলায়
মনে হয় সোহরাওয়ার্দী অথবা রমনায়,
বাজছিল ফিডব্যাকের চীরসবুজ গান "মেলায় যাইরে",
পাশে ছিলে তুমি কিন্তু ছাঁয়া হয়ে,
সেইতো শেষ বৈশাখ তোমার আমার।

মনে করিনা তোমাকে আমি
মনেও পড়েনা আর,
প্রতি বার বৈশাখী ঝড়ের রাতে
আম কুড়াবার স্মৃতি ধেয়ে আসে মনে,
কিছুই নেই এমন তোমার,
হতে পারোনি জীবনে বৈশাখ,
না হতে পেরেছো ভাবনার প্রয়াস।

বৈঠকে বৈশাখের তপ্ত রোদের বর্ণনা লিখি আমি,
এটা কবিতা হতেই পারেনা,
কবিতা হয়নি কিছুতেই,
যতোবার বৈশাখে লিখতে বসেছি কবিতা,
পারিনি কিছুতেই
কিছুতেই পারিনি,
বৈশাখী রঙ দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে
তোমাকে জড়িয়ে কিছু লিখতে।
বৈশাখ আসবে, ফিরে ফিরে ফিবছর,
মন্দলাগা এখানেই যে,
কখনো কিছু আমার আর তার
কোন বৈশাখে ফিরে আর আসবেনা।

বৈশাখ

জান্নাতুল নাঈম ঐশী
এসকেএস স্কুল এন্ড কলেজ

এলো রে এলো আবারও বৈশাখ
রঙে গানে সাজাতে সবার জীবন
চলো, সব পুরোনো কে ভুলে করি নতুন কে বরণ
বৈশাখ আসে সব ব্যর্থতাকে পিছনে ফেলে সপ্নকে করতে পূরণ
বৈশাখ আসে সব দুঃখ ভুলে আনন্দকে করতে বরণ।

নতুন দিনের নতুন প্রভাতে উঠেছে,
নতুন সূর্য পূর্ব আকাশে
মাধবী,মালতি রঙিন ফুল ফুটেছে বনে
দোয়েল, কোয়েল গায় গান মনের আনন্দে।

বৈশাখের সন্ধ্যেবেলা বটতলায়
বসবে মেলা জীবনের আনন্দখেলা
দেখতে এসো সবাই মিলে
রইল তোমাদের আমন্ত্রণ।

পহেলা বৈশাখের চরিত্র সন্ধানে

সুরজিৎ রায় মজুমদার

পহেলা বৈশাখ বাঙালির এক আত্মপরিচয়ের ঠিকানা। কী এর উৎস, কবে এর শুরু, কোন পঞ্জিকা অনুসারে তা পালন করা হয়, এসব প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কারণ সে প্রশ্নের সমাধান হয়নি। বাংলাপিডিয়ায় দাবি করা হয়েছে যে সম্রাট আকবরের সময় থেকে ফসল-নির্ভর কর আদায়ের সুবিধার জন্য চান্দ্রমাস নির্ভর হিজরি সনের পরিবর্তে বৈশাখ মাসকে শুরু ধরে ‘বঙ্গাব্দ’ চালু হয়েছিলো। তথ্যটি গবেষণানির্ভর নয়। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে এক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের এক বড় ভূমিকা আছে। চান্দ্রবর্ষের একটি নির্দিষ্ট দিন ক্রমাগত এগিয়ে আসার ফলে ফসল তোলার সময়ের সাথে সমন্বিত কর আদায়ে ঋতুগত তারতম্য দেখা দিত হিজরি সনের হিসাবে। সম্রাট আকবর সে অসুবিধা দূর করে সৌরবর্ষের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য এক বর্ষগণন পদ্ধতি বের করতে রাজ জ্যোতিষী ফতেউল্লাহ সিরাজীকে নির্দেশ দেন। সিরাজী এ মর্মে গুরত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের সন অর্থাৎ ১৫৫৬ সালকেই শুরু হিসেবে ধরে গণনা চালু করা হয় সম্রাটকে সম্মান দেখানোর জন্যে। এ কারণেই অনেকে সম্রাট আকবরের সময় থেকে পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়েছে বলে মনে করেন। তবে দিনটিকে কর আদায়ের জন্য একটা পবিত্র দিন বা ‘পুণ্যাহ’ হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে চালু করেন নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ।

আবাহমান কাল ধরে বাংলার অন্ত্যজ নিম্নবর্গের জনসাধারণ পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে আসছে। কারো কারো মতে কর গ্রহীতা জমিদার-মালিক শ্রেণি ফসলভিত্তিক কর-মাস অর্থাৎ চৈত্র মাস জুড়ে অনেক সময় জবরদস্তিমূলক কর আদায় করে প্রজাদের মধ্যে সম্ভাব্য অসন্তোষ বা বিদ্রোহ প্রশমনের জন্যই পহেলা বৈশাখে প্রজাদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে উৎসব পালন করতেন। এর সামাজিক দিকটিও উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কারণ এর মধ্য দিয়ে অসম বন্টনভিত্তিক সমাজবিন্যাসে শত বৈষম্যের মাঝেও ক্ষণিকের জন্য এক আনন্দমিলন তৈরি হতো। আরও ছিলো ব্যবসায়ীদের উৎসব ‘হালখাতা’। এরও উদ্দেশ্য ছিলো একই---পাওনা আদায়। তবু পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে এই উৎসবই ছিলো একমাত্র উপলক্ষ্য যখন উচ্চ আয়ের জমিদার মহাজনেরা অধিকাংশ নিম্ন আয়ের কৃষক-খাতক-খরিদ্দার শ্রেণিকে আপ্যায়ন করতেন।

জমিদারপ্রথা উচ্ছেদ, ভূমিসংস্কার, শিল্পায়ন এবং নগরায়নের প্রভাবে পহেলা বৈশাখ কর/পাওনা আদায় চরিত্র থেকে মুক্ত হয়ে বরং একটি সর্বজনীন বিনোদন-মূলক সামাজিক উৎসবের চরিত্র ধারণ করে। লক্ষণীয় যে, প্রথম থেকেই কোনো পর্যায়েই বাঙালির এ সাংস্কৃতিক পর্বটিতে কখনও ধর্মের প্রাধান্য ছিলো না। এটা ছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রজা-মহাজন-ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মিলিত উৎসব। শহুরে সমাজের চেয়ে গ্রামীন সমাজে এটি বেশীমাত্রায় উদ্‌যাপিত হতো যার পেছনে ছিলো সুস্পষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ। প্রথমত, শহরে বিনোদন-সূত্রের নানা উপায় খোলা থাকতো, আর পল্লীগ্রামে বিনোদনের উৎস ছিল সীমিত। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা দিবস-জাতীয় দিবসের মত পর্বগুলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে গ্রামীন মানুষের মধ্যে খুব কমই আলোড়ন তুলতো। ফলত গ্রামীন মানুষেরা ঐতিহ্যগত লোকসংস্কৃতির দিকেই চেয়ে থাকতো আনন্দ-বিনোদনের জন্য। তৃতীয়ত, স্থানীয় কৃষিজাত বা কুটিরশিল্পজাত পণ্যসমূহের বিপণনের একমাত্র সুযোগ তৈরি হতো পহেলা বৈশাখের মত উৎসবগুলো ঘিরে। পহেলা বৈশাখ ছিলো সর্বার্থেই এক সেক্যুলার ও সর্বজনীন সামাজিক উৎসব। তবুও আশ্চর্য যে এমন একটি নিছক সেক্যুলার উৎসবকে ‘হিন্দুয়ানি’র কলঙ্ক সেঁটে দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানী ঘাতক-শাসকেরা। তবে বাঙালি চিরকাল রাজনৈতিক সংকটকালে সংস্কৃতির কাছেই আশ্রয় খুঁজেছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তানীদের সাম্প্রদায়িক কূটকৌশল বুমেরাং হয়ে চূড়ান্ত পরিনতিতে তাঁদের চিরতরে বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করেছে ।

প্রথম দিকে পহেলা বৈশাখ নগর-সংস্কৃতিতে এতটা প্রভাব বিস্তার করেনি। এক সূত্র অনুযায়ি ১৯১৭ সালে প্রথম শহরাঞ্চলে নববর্ষ উদযাপনের তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু চল্লিশের দশক থেকেই সর্বস্তরের বাঙালি ভাষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের দিকে ক্রমান্বয়ে ঝুঁকতে থাকে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পাকিস্তানী কতৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে বাঙালি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘ছায়ানট’ ব্যাপক উদ্যোগ নিয়ে প্রথম রমনার বটমূলে পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু করে যা রবীন্দ্রনাথের বৈশাখের গান গেয়ে শুরু হতো এবং এখনও হয়। গ্রাম এবং শহরনির্বিশেষে সম্মিলিত বাঙালির এ সংস্কৃতিধারা পূর্ববাংলায় এক নতুন জাতীয়তাবোধের পাবন এনে প্রথম পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক মাত্রা যুক্ত করে দেয় যা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে এক গগনচুম্বী উচ্চতায় পৌঁছে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বাঙালির অশুভের বিরুদ্ধে বিজয়, সাহস এবং শান্তির প্রতীকী এবং শৈল্পিক উপস্থাপনের মাধ্যমে ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ নামে এক অভূতপূর্ব শোভাযাত্রার সূচনা করে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনে । ২০১৬ সালে ইউনেস্কো এ মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ‘নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য’ (Intangible Cultural Heritage) বলে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাংলা নববর্ষ যে প্রধানত গ্রামীন সংস্কৃতির বাহক তার প্রধান উপাদান দেখা যায় পান্তা-ইলিশে। পান্তা-ভাত কোনো শহুরে খাবার নয়, একান্তভাবেই অন্ত্যজ কৃষক শ্রেণির। পহেলা বৈশাখ যে প্রকৃতই এক অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব সে প্রসঙ্গে ড. নীলিমা ইব্রাহিমের খুলনার স্মৃতি উদ্ধৃত করা যায়: “এ দিনটিতে প্রতিটি পরিবারই অল্পবিস্তর উৎসবমুখর হতো।.. সামনে কাঁসার রেকাবীতে খই, মুড়কি, নাড়ু, বাতাসা, সামান্য দই, দুচার টুকরো ফল। দুপুরেও বড় বড় মাছ থাকত। আত্মীয়স্বজনও নিমন্ত্রিত হতেন। কিন্তু সবচেয়ে উত্তেজনাকর পর্ব ছিলো ‘আড়ং খরচা’। আমাদের অঞ্চলে মেলাকে বলে আড়ং।.. বড়রা মেলায় খরচ করবার জন্য ছোটোদের পয়সা দিতেন।..এসব উৎসব ও জলসায় হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধান দেখিনি।”

[সুরজিৎ রায় মজুমদার লেখক ও অনুবাদক।]

আব্দুল্লাহ আল-নাহিয়ান, ৪র্থ শ্রেণি, এসকেএস স্কুল এন্ড কলেজ